যায়যায়দিন

16 SEP 2008

প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ উচ্চশিক্ষার গতি-প্রকৃতি

ড. মাইমুল আহসান খান

১৯৯২ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি কাঠামো এখনো তেমন একটা শক্তিশালী হতে পারেনি। এর পেছনে মূল কারণ কি? অনেকেই বলছেন, দুর্নীতি, অনিয়ম ও শিক্ষার মানের নিম্নগতি রোধ করতে সমর্থ নয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, তাই আইন যাই হোক না কেন, এতে তেমন একটা লাভ হবে না। আমাদের দেশের বিজ্ঞজনদের অনেকেই বলেছেন, মূল সমস্যা হচ্ছে আইনের প্রয়োগের অভাব। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাকি খুব ভালো ভালো আইন রয়েছে। আসলে ভালো আইনের সংজ্ঞা নিয়েই বিভ্রান্ত ঘটেছে সর্বত্র।

ভালো ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এটা পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাত ও সংগ্রামে লিপ্ত পক্ষগুলোর মধ্যে সহজে একটি উচ্চ ও পক্ষপাতদুষ্ট নয়, এমন আইনি সমাধানে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা আমাদের দেশে একেবারেই নতুন। অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার শীর্ষে অবস্থান করছে। আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর বিরাজিত দুর্নীতি এবং অযোগ্য শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করার উপায় এখন আর কারো জানা নেই। যেসব শিক্ষক ও কর্মকর্তা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে কথা বলতে চায় বা প্রতিকার করার চেষ্টা চালায় তাদের এমন সব বিপদে ফেলা হয় যা এখনো জাতির সামনে ভেসে ওঠেনি।

এমন এক পরিস্থিতিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা আরো সুন্দর, সুষ্ঠু ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে হয়তো এ আইনটি রচিত হয়েছে। এ আইনটির ৩নং ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মুনাফা অর্জনের (মুনাফা ভাগাভাগি) লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তাই ইতিমধ্যে বহু বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোক্তারা খেপে উঠেছেন। যারা নিজেদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক বলে দাবি করেছেন বা করেন বা করতে চান তাদের অনেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার কথা বলছেন। কারণ কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে কোনোই মুনাফা ভোগ করা যাবে না, এমন যুক্তি তারা মানতে রাজি নন। এদের বিপক্ষে যুক্তি হচ্ছে, শিক্ষাকে কোনো অবস্থায়ই বাণিজ্যকরণ করা যাবে না।

শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোটাই যে মূলত বাণিজ্যকরণ করা হয়ে গেছে, এটি আমরা স্বীকার করতে চাই না অকপটে। এর পেছনে অসংখ্য আর্থিক ও সামাজিক কারণ থাকাটাই স্বাভাবিক। এসব কারণ উদঘাটন এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। তবুও একটা কথা বলে রাখা ভালো। শিক্ষা, জ্ঞান ও গুণীর কদর আমাদের সমাজে দারুণভাবে কমে গেছে। সর্বত্রই টাকার ব্যাপারটি বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্ররা অভিভাবকের বেশি টাকা খরচ করে পড়বে। এতে কিন্তু কোনো ছাত্র বা অভিভাবক ব্যাপারটি ভাব প্রদর্শন করতে চান না। বরং এ নিয়ে এক ধরনের হীনমন্যতা রয়েই গেছে এবং থাকবে হয়তো আরো বহুদিন ধরে। এটি সার্বিকভাবেই একটি কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনের ব্যাপার।

ভালো ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এটা পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাত ও সংগ্রামে লিপ্ত পক্ষগুলোর মধ্যে সহজে একটি উচ্চ ও পক্ষপাতদুষ্ট নয়, এমন আইনি সমাধানে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একক পুরোধা হওয়ার বা সাজার দিন শেষ হয়ে গেছে। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনে ব্রতী হতে হবে। আর সে কারণেই এক একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট হতে হবে কয়েকশত কোটি টাকা। এতো টাকা সংগ্রহ ও খরচ করার স্বচ্ছতার ওপরই নির্ভর করবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও সমৃদ্ধি। উদ্যোক্তারা এতো বিশাল অঙ্কের টাকা বিনা মুনাফায়ই বিনিয়োগ করবে। এমনটি আশা করা যায় না। তবে ইতিমধ্যে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র কয়েক কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বেশ কয়েকশ কোটি টাকা মুনাফা করেছে বলে প্রকাশ পেয়েছে। ওইসব টাকার হদিস পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন রাখতে পারেনি।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের কেমন আইনি সম্পর্ক থাকা উচিত তা ঠিক করার আগেই প্রয়োজন ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে এর সম্পর্কের নানাবিধ দিক পর্যালোচনা করা। ওই দুর্বলতা দূর করার জন্য এ প্রস্তাবিত আইনে বেশকিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে ৫নং ধারার (২) উপধারায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক সনদ দেয়া ও বাতিল করার প্রক্রিয়া নানা ধরনের অস্পষ্টতা ও সন্দেহের মধ্যে পড়বে। উদ্যোক্তারা যেহেতু মুনাফা করবেন না তাই বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট আইনি প্রক্রিয়ার অধীন করার প্রয়োজন পড়বে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক ও স্থায়ী সনদ প্রদানের প্রক্রিয়াটি অনেক ক্ষেত্রেই নানাবিধ জটিলতার আবর্তে ঘুরপাক খাবে। ফলে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষা লাভ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের ছাঁটাই করে ফেলতে পারবেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও ছাঁটাই ব্যবস্থার ওপরই বরং নির্ভর করবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ। অন্যথায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেয়েও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকতর সঙ্কট দেখা দেবে। শিক্ষকতা সাধারণ বা প্রচলিত অর্থে কোনো চাকরি নয়। এটিকে হতে হয় একটি পেশা ও মহান পেশায় ব্রতী হওয়ার নামান্তর। এই স্থানটাতেই আমরা আজ মার খাচ্ছি প্রতিনিয়ত। দলাদলি করে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির অপর নামই হচ্ছে আমাদের বর্তমান সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে, যদি একে সুষ্ঠু আইনি কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যায়।

সে কারণেই হয়তো ভাইস-চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও অফিসটিকে (১০নং ধারা) একটি মজবুত আইনি প্রক্রিয়ার ভেতর আনার প্রয়াস চালানো হয়েছে বর্তমান আইনের খসড়াটিতে। আগের ব্যবস্থায় ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন একজন বেতনভোগী ও উদ্যোক্তাদের হাতে জিম্মি কর্তাব্যক্তি। উদ্যোক্তারা অবশ্য বলছেন যে, খসড়াটি আইনে রূপ নিলে ভাইস-চ্যান্সেলর সর্বময় ক্ষমতার মালিক হয়ে পড়বে। কারণ পদাধিকার বলেই তিনি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সদস্য। তারা হয়তো বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজিত অবস্থা দেখে শঙ্কিত। আসলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন নাটেরগুরু যারা তারা এখনো জনসম্মুখে চিহ্নিত নয় এবং বর্তমান ব্যবস্থায় এদের চিহ্নিত করার উপায় অত্যন্ত সীমিত। তবে কয়েক সপ্তাহ আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক এ বিষয়ে গবেষণাধর্মী একটি বড় প্রকাশনা জনসম্মুখে হাজির করতে সমর্থ হয়েছেন। (বিস্তারিত দেখুন, *Those Ailing Public Universities* অধ্যাপক ইয়াহইয়া আখতার, *রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*)

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে তবে একজন ভাইস-চ্যান্সেলর কিছুতেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারবেন না।

অবশ্য বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের লোকজন যদি কাজ না করে মারামারিতে লিপ্ত হন, তবে ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতিষ্ঠানকে পঙ্গু করে ফেলতে পারবে। তারপরও বলা যায় এ আইনটিতে এমন কোনো সাংঘাতিক ব্যবস্থা রাখা হয়নি যে, এককভাবে কোনো ব্যক্তি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করে দিতে পারবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তা মহৎ উদ্দেশে ধাবিত করতে গেলে আরো বহু ধরনের সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন রয়েছে বৈকি। ওই ধরনের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা বর্তমান খসড়াটিতে অনুপস্থিত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে 'রাষ্ট্রের ভিতর রাষ্ট্র' এমন একটি আদলে রূপ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও গুণী মানুষ সৃষ্টি করে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ই পরিশেষে তামাদের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নতি, অগ্রগতি ও প্রগতির দিকে নিয়ে যাবে, এ চিন্তা থেকেই পরিচালিত হতে হবে দেশের প্রতিটি শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠ।

maimulkhan@msn.com

লেখক : অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়